তারিণী মাঝি : কয়েকটি প্রসঙ্গ

মিলনকান্তি বিশ্বাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুল জনপ্রিয় ছোটগল্পগুলির মধ্যে 'তারিণী মাঝি' অন্যতম। গল্পটি 'আনন্দবাজার' পত্রিকায়, ১৩৪২ বঙ্গাব্দের 'শারদীয়া' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

'তারিণী মাঝি' গল্পের নায়ক তারিণী, অন্ত্যেবাসী শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ। ময়ূরাক্ষীর গনুটিয়ার ঘাটে খেয়া পারাপার করে সে। তারিণীর জীবনে বৌ সুখী ছাড়া আরও একজন আছে—সে হল ময়ূরাক্ষী নদী। তারিণীর গোটাজীবনের সঙ্গে ময়ূরাক্ষীর ভূমিকা জড়িত হয়ে আছে। ময়ূরাক্ষী শুধু তারিণীর জীবিকার সংস্থানই করেনা, তার জীবনছন্দকেও নিয়ন্ত্রিত করে। এমনকি, দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির সঙ্গে ময়ূরাক্ষীর অমোঘ টানে তারিণীর জীবন, পরিণাম অভিমুখে ছুটে চলে।

তারিণী শুধু খেয়াপারাপার করে না, জলতলে কোথায় কোন্ মানুষ তলিয়ে যাচ্ছে, অবলীলায় খরস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে তাকে তুলে আনে। ময়ূরাক্ষী ছাড়াও, তারিণীর আর একজন মনের মানুষ আছে; সে বৌ সুখী। উভয়ের ভালোবাসায় এতটুকু খাদ নেই। সমস্ত সুখ-দুঃখের দিনে তারা পরস্পরের প্রেমে, আকর্ষণে একান্ত আপন হয়ে থাকে। নদীর করালগ্রাস থেকে ঘোষদের বধূউদ্ধারের বিনিময়ে তারিণী প্রথমে—'এক হাঁড়ি মদের দাম—আট আনা' দাবি করলেও, পরমুহূর্তে সে চাইতে ভোলেনি 'ফাঁদি নত' এবং দশহরার পার্বণে চাদরের পরিবর্তে 'শাড়ি'—। সুখী হয়ত সন্তান দিতে পারেনি, তবে দিয়েছে অগাধ ভালোবাসা আর নির্ভরতা।

এক বছর বাদে অর্থাৎ তেরশো বিয়াল্লিশ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে, দশহরার দিন, ময়ূরাক্ষীর পূজা করেই; ডোঙা মেরামত করে তারিণী। কিন্তু তারিণীর আশা, নিরাশায় পরিণত হলো। আষাঢ় মাস চলে গেল, বান তো দূরের কথা, নদীর বালিও ভিজল না। খরার আগাম বার্তায়, দেশে উঠলো হাহাকার। গ্রামের অনেকেই খাদ্যের অন্বেষণে পৈতৃক ভিটে-মাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে লাগল। তারিণীও নিরুপায় হয়ে গ্রাম-ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিল।

তিনদিন পথ চলার পর, অভিজ্ঞ মাঝি তারিণী, গামছা উড়িয়ে বুঝতে পারল, পশ্চিমে বাতাস বইছে। তার অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, ভারি বর্ষা আসছে। নিয়তি রূপিণী ময়ূরাক্ষীর অমোঘ টানেই সে দ্রুত গ্রামে ফিরে এসেছে, বৌ সুখীকে সঙ্গে নিয়ে। সন্ধ্যার মধ্যেই 'হড়পা' বাণের জল গ্রামে প্রবেশ করল। মুহূর্তের মধ্যেই রাস্তা ঘাট ঘর-বাড়ি সব ভেসে গেল। পশু পাখি, মানুষের প্রবল চিৎকারের সঙ্গে ময়ূরাক্ষীর প্রবল গর্জন মিলেমিশে এক ভয়াল পরিবেশ সৃষ্টি করল। গতিক ভালো নয় দেখে, সমস্ত বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করে সুখীকে পিঠে করে নিয়ে বানের জলে সাঁতার দিতে থাকে তারিণী। এখানেই তারিণীর চরম মানসিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বন্যার উত্তাল জলরাশিতে ভাসতে ভাসতেও তারিণী, সুখীকে সান্ত্বনা দেয়—'ভয় কি তোর, আমি—' কথা শেষ হয় না; মুহূর্তে তারিণী অনুভব করে, নদীর প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে তারা। পরক্ষণেই বুঝতে পারল—'অতল জলের তলে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া

চলিতেছে।' তারিণী অনুভব করে, সুখী যেন তাকে নাগপাশের মত জড়িয়ে ধরছে। সুখীর কঠিন বাহুর বন্ধনে, তারিণীর দেহ মন ক্রমশ অসাড় হয়ে আসল। কঠিন পরীক্ষা শুরু হল তারিণীর। একদিকে প্রিয়তমা স্ত্রী, অন্যদিকে নিজের প্রাণ রক্ষার তাগিদ। অনন্যসাধারণ, শৈল্পিক নিপুণতায় গল্পকার তারাশঙ্কর, নির্মম সেই পরিণতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে—"তারিণী-সুখীর দৃঢ়বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে আরও জোরে জড়াইয়া ধরিল। বাতাস-বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। দুই হাতে প্রবল আক্রোশ সে সুখীর গলা পেষণ করিয়া ধরিল।" সুখীর প্রতি তারিণীর এমন খাঁটি মানবিক প্রেম তুচ্ছ হয়ে গেল তার আদিম জৈব-জীবনতৃষ্ণার কাছে।

'তারিণী মাঝি' গল্পের পরিণাম ক্রুর ভয়াবহ হলেও, লেখকের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এর মধ্যে নিহিত। চরম মুহূর্তে মানুষের কাছে নিজের জীবন ছাড়া আর কিছুই প্রিয় নয়—কর্তব্যবোধ, ভালোবাসা কিছুই নয়। তারিণী যে সুখীকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে, তা তার সচেতন ইচ্ছাজাত নয়। তার জীবন পিপাসার অনুসারী 'আলো ও মাটি'র স্পর্শ প্রাপ্তির চরম আর্তিই প্রকাশিত হয়েছে তার অভিব্যক্তিতে—'আঃ আঃ—বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে কামনা করিল, আলো ও মাটি।'

মানবজীবনের অস্তিত্ব রক্ষার যে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে, তার মধ্যে অন্যতম হল আত্মরক্ষার তাগিদ। এই তাগিদের কারণেই, তারিণী তার জীবনের ব্রত থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সে, তার নামের মর্যাদা ধরে রাখতে পারেনি। 'তারিণী' কথার অর্থ—যে ত্রাণ করে, অর্থাৎ গল্পে তার ভূমিকা ত্রাতার হলেও সে শুধু খেয়াপারাপার করে না; বন্যার জলে ভেসে যাওয়া মানুষ জনকেও বাঁচায়। কিন্তু গল্পের অন্তিমে জীবনরক্ষার বা অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে প্রিয়তমা স্ত্রী সুখীকে গলাটিপে হত্যা করে, জীবনদাতার ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হয়েছে সে। এখানেই তার নামের ট্র্যাজেডি। তবে এই ট্র্যাজেডিতে গল্প শেষ হয়নি। তারিণীর বেঁচে ওঠার মধ্যে, তার যে জীবনপিপাসা প্রকাশিত হয়েছে, তা সর্বকালের মানুষের আদিম জৈব-প্রকৃতির অনুসারী।

সুতরাং, দেখা গেল, তারাশঙ্করের এ গল্পে, ধাতুপ্রবৃত্তির জয় নয়, ধাতুপ্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে মানবজীবনের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে, তারিণীর 'আলো ও মাটি' কামনার মধ্যে। 'আলো ও মাটি' এখানে জীবনের প্রতীক। গল্প লেখার ক্ষেত্রে, লেখক স্বয়ং যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—

> "জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে, সেই খানেই তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক বলে জেনেছে—ইচ্ছে হলো এমনই গল্প লিখব।"

এ গল্পে লেখক সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। উপসংহারের এই চমকপ্রদ অনিবার্যতা সৃষ্টির অপূর্ব বস্তু-নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার দ্বারাই সম্ভব।

দুই

২.১ 'তারিণী মাঝি' গল্পটি চরিত্রমুখ্য গল্প। নামকরণের মধ্যেই তা বোঝা যাচ্ছে। তারিণী মাঝিকে কেন্দ্র করেই, গল্পের সমস্ত ঘটনা আবর্তিত। মাটিও মানুষের সংস্পর্শ ব্যতীত এমন চরিত্রসৃষ্টি, অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হবে না। তারিণী ও ময়ূরাক্ষী মিলেমিশে সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এদের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা মূল্যহীন বলে মনে হয়।

লোকালয়ে তারিণী মাথা হেঁট করে চল্‌লেও নদীর বুকে সে 'খাড়া-সোজা'। নদী ব্যতীত তারিণী যে অসম্পূর্ণ, এ ইঙ্গিত-ময়তা দিয়েই গল্পের শুরু। গঙ্গাস্নান-ফেরত পুণ্যার্থীদের উদ্দেশ্যে তারিণীর উক্তির মধ্যে তার চরিত্রের প্রবল কৌতুক রসিকের দিকটি ধরা পড়ে। ভদ্র সভ্য সমাজের রমণীরা যখন বিবেক বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে, যেন তেন প্রকারেণ কার্যসিদ্ধি করতে চায়; তখন অন্ত্যেজ শ্রেণীর একজন মাঝির মুখে এ হেন পরিহাস—'আর লয় গো ঠাক্‌রুণরা, আর লয়। গঙ্গাস্নান ক'রে পুণ্যির বোঝায় ভারী হয়ে আইছ সব।' আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে পীড়িত করে।

তারিণীর ভালোবাসা ময়ূরাক্ষী ছাড়াও আরেক জনের ওপর, সে-তার স্ত্রী সুখী। তবুও জন্মগত অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে সে ঘোষদের বধূ উদ্ধারের প্রাপ্য হিসাবে সর্বাগ্রে 'এক হাঁড়ি মদের দাম—আট আনা' চেয়ে বসল। এখানেই তারিণী, আদিমজীবনস্বভাবের ক্রীড়ানক। যখন তার সে চাহিদা পূরণ হয়েছে, তখন সে একে একে চেয়েছে তার মনের মানুষকে সাজানোর সামগ্রী—'ফাঁদিলত', 'শাড়ি' ইত্যাদি। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—'লোতুন হয়েছে দেশে ফাঁদি লতের আমদানি।' এখানেই সে থেমে থাকার পাত্র নয়, স্ত্রীকে সে নথ পরিয়ে; উচ্ছিষ্ট হাতে লম্ফ তুলে ধরে স্ত্রীর মুখের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে থেকেছে। তারিণীর স্বভাব কোমলে কঠোরে গড়া। এটা তার কোমলতার দিক। 'সুখীর জন্য তারিণীর সুখের সীমা নাই।' ঠিককথা, তবে এসুখের পিছনে রয়েছে ময়ূরাক্ষীর অকৃপণ দান। আর সে কারণেই তারিণী 'বানের লেগে পূজো দেয়।'

পরের বছর তারিণী পূজো দিলেও দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে নদীতে জল না থাকায় সে সরকারী কর্মচারীদের সাইকেল পারাপার করে সংসার চালাতে থাকে। শ্রাবণের শেষে বন্যা এলো বটে, তবে তিনদিনের মধ্যে, তা হাঁটুজলে নেমে আসল। ময়ূরাক্ষী, তারিণীর ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের সঞ্চার করল। বানাভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সেঙাৎ কালাচাঁদ দেশত্যাগ করল। শুধু কেলে নয়, পাড়ার সকলেই—। পলাশ ডাঙার একব্যক্তির গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার খবরে তারিণী কিছুটা ভীতও হলো।

যে ময়ূরাক্ষী ছাড়া তারিণী অসম্পূর্ণ, সেই ময়ূরাক্ষীকে ত্যাগ করে, তারিণী শহরের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়। গ্রাম্য জীবন ত্যাগ যেমন তার বেদনা দিল, তেমনি বেদনা দিল তার নামও। তারিণীর বাস্তববোধ প্রখর। পথে চল্‌তে চল্‌তে গামছা উড়িয়ে তার বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, তখনই বান আসবে। তিনদিনের পথ, তারিণী সুখীকে নিয়ে দুদিনেই ফিরে আসে। তার পক্ষে সবই সম্ভব। জলের শরীর রোদে টান ধরেছিল, জল পেয়ে আবার ফুল্‌ল।

মুহূর্তের মধ্যেই, প্রবল হড়পাবানে সমস্ত পথ-ঘাট ভাসিয়ে নিয়ে গেল। নদী-লোকালয় একাকার হয়ে গেল। সুখীরও পরম নির্ভরস্থল স্বামী তারিণী। তাই দাওয়ার উপর বানের জল আসা সত্ত্বেও, সে চালের বাঁশ ধরে পরমভরসায় স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে থাকে। প্রবল সাহসিকতায় তারিণী, সুখীকে পীঠে করে অকূল পাথারে, কূলের আশায় সাঁতার দিল। এখানে তারিণীর চরম স্বভাবের পরিচয় মেলে। কিন্তু গভীর বিচক্ষণ দৃষ্টির অধিকারী তারিণীর, সব হিসেব ভুল হয়ে গেল। তারা গিয়ে পড়ল নদীগর্ভে। হয়ত, ময়ূরাক্ষী, তার শেষ পরীক্ষায় তারিণীকে উত্তীর্ণ হতে বল্‌ল। তারিণী, সুখীকে আশ্বাস দিতে কুণ্ঠিত হয়নি—'ভয় কি তোর,

আমি—' পরমুহূর্তে তারিণী অনুভব করল, —'অতল জলের তালে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা ডুবিয়া চলিতেছে।' সুখীর বাহুর কঠিন বন্ধনে তারিণীর তাগদ শরীর যেন অসাড় হয়ে এল। লেখক অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞায় গল্পকে পৌঁছে দিলেন ক্লাইমেক্সে—'বাতাস—বাতাস! যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমুহূর্তে হাত পড়ল সুখীর গলায়।' গল্পের নায়ক এক পলকে হয়ে গেলেন 'ট্রাজিক হিরো'। তার জীবনার্তির কাছে সুখীর এমন মানবিক প্রেম মিথ্যা হয়ে গেল। তারিণীর 'আলো ও মাটি'র কামনায় আদিম জৈব প্রবৃত্তির জয় হলো। প্রাণধর্মের জয় হলো। তারিণী, চিরন্তন কালের রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠল।

২.২. সুখীকে বোঝার ক্ষেত্রে তারিণীর একটি উক্তিই বোধ হয় যথেষ্ট—''উ না থাকলে আমার 'হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি' হয় ভাই।'' বানের দ্রব্য ধরা নিয়ে যখন কেলে ও তার স্বামীর মধ্যে বিবাদ তুঙ্গে, তখন সে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে স্বচ্ছ সাবলীল ভঙ্গিতে মীমাংসা করে দিয়েছে। অর্থাৎ তারিণী ময়ূরাক্ষীর ত্রাতা হলেও লোকালয়ের ত্রাতা সুখী। সুখী হয়ত সন্তান দিতে পারেনি ঠিকই, তবে, তার স্বামী তারিণীকে ভালোবাসা দিয়ে প্রেয় ও শ্রেয় করে তুলেছে। সেখানে কোন খাদ নেই। সুখীর এই করুণ পরিণতি দেখে, তার প্রতি আমাদের প্রবল সমবেদনা জাগে। এই কঠিন সত্যের পিছনে আমাদের বিবেক বুদ্ধি সায় না দিলেও; ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস হিসেবে মানতে বাধ্য হই।

২.৩ কালাচাঁদ ওরফে কেলে, তারিণীর নৌকার দাঁড়ী। সেও নেশায় বিভোর হয় বটে, তবে তার মাঝির মত সমস্ত রাস্তায় 'নেলা' কাটা দেখে না। তাকে দেখে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি বলে মনে হয়। বানের ভাসা দ্রব্য ধরা নিয়ে, তারিণী তাকে অপমান করলে সে—'...অপমানে আগুন' হয়ে ওঠে। আবার সুখী মিমাংসা করে দিলে, সে 'সুখীর পায়েব ধূলা লইয়া কাঁদিয়া, বুক ভাসাইয়া' দেয়। অর্থাৎ তার সম্ভ্রমবোধ প্রবল। অন্যমনস্কতার কারণে, তারিণী তাকে ঠাস্ করে 'চড় কষিয়ে দিলে' সে শিশুর মত অপলক নয়নে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এখানেই তার শিশুসুলভ সারল্য ধরা পড়ে। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে সে গ্রাম ত্যাগে বাধ্য হয়। শুধু তারিণী নয়, এগল্পের প্রত্যেকেরই জীবনতৃষ্ণা প্রবল। সুখীর জীবনতৃষ্ণার প্রাবল্যে, তার স্বামী তারিণীর পীঠে চড়ে প্রবল বানের মধ্যে কূল পেতে চেয়েছিল, কেলেও জীবনতৃষ্ণার জন্য পৈতৃক ভিটেমাটি ত্যাগে কুণ্ঠিত হয়নি, তারিণীও জীবনতৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে সুখীকে গলাটিপে হত্যা করেছে। এ গল্পে প্রত্যেকেই তাই জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছে।

তিন

৩.১ তারাশঙ্করের শিল্পনৈপুণ্য ও শিল্পনিরাসক্তি—দুইয়েরই উৎকৃষ্ট নিদর্শন 'তারিণী মাঝি'। গল্পটি চরিত্রপ্রধান। তাই গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীর অস্তিত্ব, চরিত্রের অবয়বে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পে প্রত্যক্ষ কাহিনীতে আছে মাত্র দুটি চরিত্র—তারিণী আর সুখী। লেখকের বর্ণনাগুণে ও প্রকৃতিদর্শনের গুণে ময়ূরাক্ষীও স্বতন্ত্র চরিত্র হয়ে উঠেছে। গল্পের কাহিনীবৃত্তটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অস্বাভাবিক দীর্ঘদেহী নিঃসন্তান তারিণী, ময়ূরাক্ষী নদীর মাঝি। তার একমাত্র সঙ্গী কালাচাঁদ বা কেলে। এই ময়ূরাক্ষীর বুকে, তারিণীর জীবনে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনাকে দক্ষতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন লেখক।

গল্পের আরম্ভেই আছে শিল্পের শাসন; শেষেও তাই। লেখক এখানে নিরাসক্ত দ্রষ্টা। আরম্ভ হয়েছে তারিণীর কথা দিয়ে, তার সহজ স্বাভাবিক যাত্রী পারাপারের বৃত্তান্ত দিয়ে। আর শেষ হয়েছে অস্বাভাবিক পরিবেশে তারিণীর জীবনরক্ষার চিত্রাঙ্কনে। গল্পের শুরুতে, কাহিনীনিহিত গল্পাংশের হাত ধরেছে তারিণী-মাঝি স্বয়ং। আষাঢ় মাসের অম্বুবাচিতে ফেরত গঙ্গাযাত্রী-র ভিড়ে, তারিণীর ডোঙায় পারাপারের ঘটনায় তারিণী কাহিনীর মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পারাপারের সময়টুকুর মধ্যেই ঘোষ বউ-এর ডুবে যাওয়ার ঘটনা, তারিণীকে ঘটনাবর্তের সঙ্গে যুক্ত করে। কাহিনী বয়নে লেখকের অতিসচেতন সংযত শিল্পভাবনা এখানে লক্ষ করার মত। এতটুকু বাড়তি অংশ নেই। ময়ূরাক্ষী ও তারিণীর যৌথভাবে কাহিনীকে টেনে নিয়ে যাবার মধ্যেই আসে তারিণীর মনের মানুষ স্ত্রী সুখী এবং তার লোভনীয় দুর্বার প্রেম। অন্যদিকে, ময়ূরাক্ষী শুষ্করূপে তারিণীর জীবনে প্রেমহীনতার প্রতীক হয়ে হাজির হয়। ময়ূরাক্ষীর শুষ্ক পরিবেশ যেন, তারিণী-সুখীর প্রেমের গভীরতার পরীক্ষার সুযোগ করে দেয়। কাহিনীর হাল তারিণী ও সুখী ধরে থাকে।

অবশেষে, ময়ূরাক্ষীর প্রবল বন্যায়, তারিণীর জৈব আদিম জীবন প্রেমের কাছে, জাগতিক মানবপ্রেম মিথ্যে হয়ে যায়। এখানেই গল্পের গর্ভঃসন্ধি বা climax। নাটকীয় বিন্যাসের মধ্যে তীব্রগতিতে, চূড়ান্ত পরিণতির এক চমকপ্রদ অনিবার্যতায় নীত। 'ক্লাইমেক্সের (climax) চূড়ান্ত শীর্ষবিন্দুতে শব্দ চয়ন ও বিন্যাসে যে কত সতর্ক ও প্রজ্ঞা-চক্ষু হতে হয়, শিল্পী তারাশঙ্কর তা আমাদের দেখিয়ে দেন।'

সবশেষে বলা যায়, এগল্পের কাহিনীবৃত্ত নিটোল পরিমিত ও সংযত। লেখকের মূল বক্তব্যের পক্ষে যতটুকু জরুরী, ততটুকুই উপস্থিত করেছেন। সার্থক গল্পের উপযোগী কাহিনী বয়নে লেখক সিদ্ধহস্ত। কাহিনী অংশে ঘটনাংশও স্বল্প।

৩.২. তারাশঙ্কর, সাধু ও চলিত—যে ভাষারীতিতেই লিখুন না কেন, কথোপকথনের ক্ষেত্রে মুখের ভাষাকেই ব্যবহার করেছেন। সাধুভাষার পরিবেশ ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তৎসম শব্দের বহুল পরিমাণে ব্যবহার ঘটিয়েছেন। যেমন—পথশ্রমকাতর, লক্ষ্যভ্রষ্ট, করতল, রৌদ্রাভয়, তরঙ্গ, শ্বাসরোধ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের মত, তারাশঙ্করও সাধুভাষায় লেখা শুরু করলেও পরে চলে গেছেন চলিত ভাষার দিকে। বিশেষতঃ উত্তররাঢ়ের ভাষা তাঁর গল্পগুলির ভাষায় আঞ্চলিক আবহাওয়া তৈরী করেছে। তারিণীর ভাষায় রাঢ়ের প্রভাব ধরা পড়েছে—

(i) 'আর **লয়** গো ঠাকরুণরা আর **লয়**।'

(ii) 'আর **মান কেড়ো** না মা, দম **লাও** দম **লাও**। সেই যে বলে—লাজে মা **কুঁকড়ি বেপদের** ধকুড়ি।' ইত্যাদি।

পাশাপাশি ভদ্রসমাজের ভাষায় এসেছে আদর্শ কথ্য ভাষা—'হ্যাঁ বাবা তারিণী, বউমা বুঝি খুব নাক নেড়ে কথা কয়?' কিংবা ঘোষমহাশয়ের উক্তি—'দশহরার সময় পর্বণী রইল তোর কাপড় আর চাদর, বুঝলি তারিণী?' ইত্যাদি। তারিণী যখন বলে—'ই আমার জলের শরীল, রোদে টান ধরে, জল পেলেই ফোলে।' 'শরীর' এখানে 'শরীল' হয়ে ধ্বনিগত রূপান্তর ঘটেছে। কিংবা অন্যত্র তারিণী বলে—'জল হয় নাই, ক্যালেন আছে কিনা' এখানে ক্রিয়ার সাধুরূপ এবং কথ্যশব্দ-এর সঙ্গে বর্ণবিপর্যয় ঘটে এক নতুনত্ব দান করেছে। বর্ণনাংশে

সমান্তরালতা (Paralleism) ধরা পড়ে—'সুখী তন্বী', 'সুখী সুশ্রী।' নেশাগ্রস্ত তারিণীর কণ্ঠে একই শব্দের পুনঃপুন আবর্তনে, তার উন্মত্ততার রূপ যেমন ধরা পড়েছে; তেমনি জলের আবর্তর প্রতিমা তৈরি করেছে—'জলাম্পয়—সব জলাম্পয় হয়ে যায়, সাঁতরে বাড়ি চলে যাই।' আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহারে তারিণীর ভাষা জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এ গল্পের পুরুষচরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রের ভাষা আরও বেশি রাঢ়ঘেষা বলে মনে হয়—'সুখী বলিল, আর কি বান বাড়ে গো? ... ছিষ্টি কি আর লষ্ট করবে ভগবান?' চরিত্র বর্ণনায় লেখক যেমন দক্ষতা দেখিয়েছেন, তেমনি ভাষা রহস্যময় হয়ে উঠেছে প্রকৃতিবর্ণনায়—'বারো মাসের মধ্যে সাত-আট মাস ময়ূরাক্ষী-মরুভূমি, এক মাইল দেড় মাইল প্রশস্ত বালুকারাশি ধু-ধু করে। কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে সে রাক্ষসীর মত ভয়ঙ্করী।' নানা উপমাদি প্রয়োগে, লেখক প্রকৃতির ভয়ঙ্করতা বাস্তবোচিত করে তুলেছেন—"গরু ছাগল ভেড়া কুকুরের সে কি ভয়ার্ত চিৎকার! কিন্তু সে সমস্ত শব্দ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল ময়ূরাক্ষীর গর্জন; বাতাসের অট্টহাস্য আর বর্ষণের শব্দ—লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল অট্টহাস্য ও চিৎকারে যেমন করিয়া ভয়ার্ত গৃহস্থের ক্রন্দন ঢাকিয়া দেয়, তেমনি ভাবে।" কখনও প্রকৃতির কোমলরূপের বর্ণনায় লেখক উপযুক্ত উপমা ব্যবহার করেছেন—'রাঙা জলের মাথায় রাশি রাশি পুষ্পিত ফেনা ফুলের মত দ্রুত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।'

গল্পের সমাপ্তিতে থমথমে পরিবেশে, কাটাকাটা বাক্য ব্যবহৃত হওয়ায় এবং ক্রিয়াপদকে বাক্যের শেষে ব্যবহার করে, বিপর্যয়ের ভাবকে অনেকটা লাঘব করার চেষ্টা করেছেন লেখক। সবশেষে বলা যায়, সাধুরীতির গদ্য এবং তৎসমবহুল শব্দের ব্যাপক ব্যবহারে, এক অপূর্ব ছন্দোময় জগৎ উদ্ভাসিত হয়েছে তারাশঙ্করের গদ্যে।

চার

রাঢ়বাংলার নানা বিশ্বাস, সংস্কার, মৌখিক সাহিত্যের নানা উপাদান যেমন—প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি তারাশঙ্করের সাহিত্যে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। 'তারিণী মাঝি' গল্পেও সে বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। গল্প শুরু হয়েছে, গঙ্গাস্নান যাত্রীদের প্রত্যাগমনের মধ্যদিয়ে। তাদের বিশ্বাস, পুণ্যদিনের পবিত্রক্ষণে গঙ্গাস্নান করলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। লোকায়ত মানুষ নানা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মে বিশ্বাসী, তারিণীও 'বানের লেগে পূজো দেয়।' এই উপলক্ষ্যে সে, পাঁঠাবলিও দেয়।

লোকায়ত সমাজের বিশ্বাস, পিঁপড়ে মুখে ডিম নিয়ে চল্‌লে প্রবল বন্যা হয়। তারিণীও গ্রাম ত্যাগ করে পথে চলার সময়ে লক্ষ করেছে—'পিঁপড়েতে ডিম মুখে নিয়ে ওপরের পানে চলল।' কিংবা অন্যত্র বিপদের সঙ্কেত পেয়েছে তারিণী—'দেখিতে, দেখিতে সর্বাঙ্গ তাহার পোকায় ছাইয়া গেল।'

লোকায়ত মানুষ আধুনিক যুক্তি-বিদ্যায় পারদর্শী না হলেও, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তারা ভীষণ বিচক্ষণ হয়। তারিণীও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়, গ্রাম ত্যাগ করার পূর্বে সে কেলেকে বলে—"বাতাস ঘুরেছে, লয় কেলে, পচি বইছে না? বলিতে বলিতেই সে লাফ দিয়া ডাঙায় উঠিয়া শুষ্ক বালি একমুঠা ঝরঝর করিয়া মাটিতে ফেলিতে আরম্ভ করিল।" তিনদিন পথ চলার পর, তারিণী হঠাৎ সুখীর কাছ থেকে গামছা চেয়ে নিয়ে—'হাতে

ঝুলাইয়া সেটাকে সে লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিল।' এরপর সে, দ্রুত গ্রামে ফিরেছে।

লোকায়ত সমাজে আসন্ন বিপদের বার্তা হিসেবে গ্রামে গ্রামে টিন, ডুগডুগি বাজিয়ে ঢেঁড়া দেওয়ার রীতি লক্ষ করা যায়। এ গল্পেও দেখি তারিণী সুখীকে বলেছে—'কি একটা 'ডুগডুগ' শব্দ শোনা যায় না?' এরকম অসংখ্য বিশ্বাস সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-আচরণকে লেখক নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এ গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে।

মৌখিক সাহিত্য-ধারার মধ্যে প্রবাদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এ গল্পেও কয়েকটি প্রবাদের দৃষ্টান্ত মেলে। তারিণী, সুখীকে বলে 'মায়ের বুকে ভয় থাকে?' কিংবা 'ময়ূরাক্ষীর পলিত দেশে সোনা ফলে।' ময়ূরাক্ষী, তারিণীর কাছে 'মা'-এর সমান। আবার, ময়ূরাক্ষীর বন্যার জলে আসা পলিতে দুইতীরে সোনার ফসল ফলে—এসত্যও তারিণীর কণ্ঠে উচ্চারিত প্রবাদে ধরা পড়েছে। বানের জিনিস ধরা নিয়ে তারিণী কেলেকে ব্যঙ্গ করে বলে—'বড় ঘুরন-চাকে তিনটি বুটবুটি।' কখনও বলে—'পচি দিকেও তো ডাকে না।' আবার সুখী সম্পর্কে সে বলে—'হাড়ির ললাটে ডোমের দুগগতি।' আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তারিণীর কণ্ঠে একটি ছড়ামূলক প্রবাদ উচ্চারিত হয়েছে—'কাক কুটো তুলেছে/—বাসার ভাঙা ফুটো সারবে।'

কেবল প্রবাদ নয়, প্রবাদমূলক বাক্যাংশের ব্যবহার-ও লক্ষ করা যায় বিভিন্ন চরিত্রের মুখে; যেমন—'পেট আঁচলে', 'শরীল বুজি পাথরের?' ইত্যাদি। একটি সঙ্গীতেরও ব্যবহারও লক্ষ করা যায় এ-গল্পে। আকণ্ঠ মদ গিলে ঘরে ফিরে তারিণী; সুখীকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গান ধরে—'লো-তুন হয়েছে দেশে ফাঁদি লতের আমদানি—।' এগানের কথা তারিণীর জীবনসঞ্জাত এবং এর সুর হৃদয়মন্থনজাত। তারশঙ্করের এ গল্প এরকম অসংখ্য লোকায়ত উপাদানে ভরপুর।

কোনও সৃষ্টি তখনই চিরকালের হয়ে ওঠার ছাড়পত্র পায়, যখন তার মধ্যে একক সমস্যা তাবৎ মানুষের সমস্যা হয়ে ওঠে। 'তারিণী মাঝি' গল্পে তারিণীর 'আলো ও মাটি' কামনার মধ্যে সেই একক সমস্যা চিরন্তন সত্যে উন্নীত হয়েছে, যা, দেশ-কাল-নির্বিশেষে তাবৎ মানুষের জীবনে এক কঠিন পরিস্থিতিতে হয়ত সত্য। তারাশঙ্করের এগল্প রসোত্তীর্ণ ও শিল্প সার্থক হয়ে উঠেছে।